প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online)
ISSN: 2321-9319 (Print)

বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব : একটি সমীক্ষা

ড. ছন্দা চ্যাটার্জী

Abstract

In Buddhist Epistemology valid knowledge is usually termed as the knowledge that is in harmony with its object. As argued by the Buddhist Philosophers, there are two kinds of valid knowledge—perception and inference. The knowledge derived from perception is direct and immediate knowledge of the object. Dharmakirti viewed perception as a non-erroneous presentation devoid of all determinations or conceptual construction. It is the immediate apprehension of an object in its uniqueness, unassociated with names and other determinations. Santarakshit agrees with Dharmakirti in this regard. Dignaga, however, held an altogether different view about perception. Nevertheless, these three Buddhists philosophers agree that only indeterminate perception is valid perception, since it apprehends the uniqueness of an object devoid of all qualifications. In the light of the arguments put forward by these Buddhist Philosophers, the present paper aims at finding out the influence of valid knowledge in Buddhist Epistemology.

Key Words: Perception, Valid Knowledge, Buddhist Epistemology.

প্রমাণ সম্পর্কে নৈয়ায়িক ও বৌদ্ধদের বিতর্ক ভারতীয় প্রমাণশাস্ত্রকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। নৈয়ায়িক ও বৌদ্ধ উভয়েই বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে নিজ নিজ মতের সমর্থনে যে সব যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, তার দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের প্রমাণশাস্ত্রে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। প্রমাণের স্বরূপ সম্বন্ধে বৌদ্ধ দার্শনিক দিগনাগ, ধর্মকীর্তি, শান্তরক্ষিত প্রমুখদের মতবাদ ভারতীয় দর্শণের প্রমাণতত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আবার প্রাচীন নৈয়ায়িকরা বৌদ্ধ প্রমাণতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ের যে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন সেটাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে বৌদ্ধদের মতের তাত্ত্বিক আলোচনা এবং নৈয়ায়িকদের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ।

দিগ্‌নাগ তাঁর *প্রমাণসমুচ্চয়* গ্রন্থে বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন "প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং নামজাত্যাদ্যসংযুতম"[১] অর্থাৎ যে জ্ঞান কল্পনারহিত, যে জ্ঞানে নাম, জাতি প্রভৃতি কল্পিত পদার্থের যোজনা হয় না, সেই জ্ঞানই হলো প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের এই লক্ষণটিতে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, দিগনাগ প্রত্যক্ষ বলতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকেই বুঝিয়েছেন। কারণ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেই একমাত্র নাম, জাতি ইত্যাদির যোজনা হয় না। দিগ্‌নাগ প্রদ্দত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটিতে 'প্রত্যক্ষং' এবং 'কল্পনাপোঢ়ং' পদ দুটিকে সমার্থক বলে মনে হলেও এই পদ দুটি কিন্তু সমার্থক নয়। কারণ, পদ দুটি বিভিন্ন প্রকারে অর্থের উপস্থাপন করে। পদ দুটি উদ্দেশ্য-বিধেয় ভাবাপন্ন একটি বিশিষ্ট অর্থের

প্রতিপাদন করে। উদাহরণ স্বরূপ : 'গৌঃ গলকম্বলবান্' বাক্যটিতে 'গৌঃ' ও 'গলকম্বলবান্' – পদ দুটি একই অর্থ উপস্থাপন করে। কারণ যা গো, তাই বাস্তবিকুপক্ষে গলকম্বলবান্ হয়। গো থেকে গলকম্বলবানের অর্থ আলাদা হয় না। তবুও কিন্তু পদ দুটি সমার্থক নয়, কারণ 'গো' পদটি অর্থের উপস্থাপনা করে গোত্ব রূপে এবং 'গলকম্বলবান' পদটি অর্থের উপস্থাপনা করে গলম্বলবানবত্ব রূপে। তবে উদ্দেশ্য বিধেয় ভাবে একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করে এই পদ দুটি। অনুরূপভাবে 'প্রত্যক্ষং' এবং 'কল্পনাপোঢ়ম্' পদ দুটি একসঙ্গে একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করে।

যে পদটি সাধারণত বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই সমস্ত প্রকারে অর্থের উপস্থাপনা করে, তাকে বলা হয় উদ্দেশ্যবোধক পদ এবং যে পদ স্ব-সম্মত প্রকারে অর্থের উপস্থাপনা করে, তাকে বলা হয় বিধেয়বোধক পদ। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে 'কল্পনাপঢ়ত্ব' পদটি হলো বিধেয়বোধক পদ। কারণ, এই পদটি কেবলমাত্র বৌদ্ধমতেই স্বীকৃত হয়েছে, অন্য মতে নয়। দিগ্নাগ 'প্রত্যক্ষ' পদটির দ্বারা বুঝিয়েছেন অক্ষ বা ইন্দ্রিয়াশ্রিতরূপ বিজ্ঞানকে এবং 'কল্পনাপোঢ় পদটির দ্বারা সেই একই বিজ্ঞানের কল্পনাশূন্যত্বভাবকে বুঝিয়েছেন। দিগ্নাগ ইন্দ্রিয়গোচরত্ব বা ইন্দ্রিয়াশ্রিতত্ব প্রকারে প্রত্যক্ষরূপ উদ্দেশ্যবোধক পদে স্ব-সম্মত 'কল্পনাপোঢ়ত্ব' রূপ বিধেয়বোধক পদের বিধান করেছেন। ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষের লক্ষণে বিধেয়পদ রূপে 'কল্পনাপোঢ়' এবং 'অভ্রান্ত' পদ দুটি স্বীকার করেছেন। কিন্তু দিগ্নাগ বলেছেন যে, সকল বিকল্পজ জ্ঞানই হলো ভ্রান্তজ্ঞান। যেমন, শুক্তিতে রজতভ্রম, মরীচিকায় জলভ্রম ইত্যাদি। অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান হলো বিকল্পজজ্ঞান, তাই অনুমান তাঁর মতে এক অর্থে ভ্রান্ত। তাই তাঁর মতে 'কল্পনাপোঢ়' পদটির দ্বারা অনুমান ও অন্যান্য ভ্রমাত্মকজ্ঞান উভয়ের থেকেই প্রত্যক্ষের ভেদ সূচীত হয়। এইজন্যই তিনি প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অভ্রান্ত' পদের ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। উপরন্তু তিনি বলেছেন যে, প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অভ্রান্ত' পদের ব্যবহার করলে পুনরুক্তিমূলক দোষের উদ্ভব হবে। কারণ, 'কল্পনাপোঢ়' পদটির দ্বারাই সকল প্রকার ভ্রমের সম্ভাবনা দূরীকৃত হওয়ায় প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অভ্রান্ত' পদটির ব্যবহার নিরর্থক হবে। তাই তিনি প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এভাবে, "প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং"। দিগ্নাগ 'প্রমাণসমুচ্চয়'এর স্বোপজ্ঞ বৃত্তি গ্রন্থে কল্পনার স্বরূপ প্রতিপাদন করতে গিয়ে বলেছেন যে, অর্থে নাম, জাতি ইত্যাদির যে যোজনা অর্থাৎ যোগ, তাই কল্পনা.[২] 'অয়ং গৌ' এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে গোত্বাদি জাতির যোজনা, 'অয়ং শুক্লঃ' এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থে শুক্লাত্বাদি গুণের যোজনা, 'অয়ং পাকঃ' এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থে পাকাদি ক্রিয়ার যোজনা এবং 'দন্ড্যহয়মক্ষেত্রে' এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থে দন্ড দ্রব্যের যোজনা হয়। এই যে যোজনা বা অর্থে নাম, জাতি ইত্যাদির সম্বন্ধ স্থাপন একেই তিনি বলেছেন কল্পনা। 'আপোঢ়' পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রমাণসমুচ্চয়ের স্বোপজ্ঞ বৃত্তি গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, যে জ্ঞান উক্ত কল্পনার অত্যন্তাভাববান, তাই কল্পনাপোঢ় এবং প্রত্যক্ষ। সুতরাং দিগ্নাগের ব্যাখ্যা অনুসারে কল্পনার অর্থাৎ নাম, জাতি ইত্যাদির যোজনার অত্যন্তাভাববিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব, তাকেই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা যায়। দিগ্নাগের বক্তব্যের এটাই তাৎপর্য্য যে, প্রত্যক্ষজ্ঞানে অর্থই বিষয় হয়, বাচক নাম তাতে বিষয় হয় না.[৩]

ধর্মকীর্তি 'প্রত্যক্ষ' পদের দ্বারা সাক্ষাৎকারী বিজ্ঞানত্ব প্রকারে উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের নির্দেশ করে, তাতে অভ্রান্তত্ববিশিষ্ট কল্পনাপোঢ়ত্বকে নিজসম্মত লক্ষণরূপে বিহিত করেছেন। তিনি দিগ্নাগের লক্ষণটিতে 'অভ্রান্তং' নতুন একটি পদ সংযুক্ত করেছেন। তাঁর মতে যে জ্ঞান কল্পনারহিত ও অভ্রান্ত, তাই প্রত্যক্ষ.[৪] এই সংজ্ঞায় দুটি পদ গুরুত্ব পেয়েছে, যথা – 'কল্পনাপোঢ়' ও অভ্রান্ত'। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, দিগ্নাগ, ধর্মকীর্তি উভয়ের প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণের 'কল্পনাপোঢ়' পদটি থাকলেও কিন্তু 'কল্পনাপোঢ়' বিশেষণটির অর্থ নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মকীর্তি 'কল্পনা' পদের অর্থ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "অভিলাপসংযোগ্যপ্রতিভাস প্রতীতিঃ কল্পনাঃ"। অভিলাপ হচ্ছে পদার্থের বাচকশব্দ। যে জ্ঞানে এই অভিলাপের সংসর্গযোগ্য প্রতিভাস অর্থাৎ অভিধের অর্থের প্রকাশ হয়, তাই "কল্পনা"। দিগ্নাগ কল্পনার স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নামাদির যোজনাই কল্পনা। অর্থাৎ তাঁর মতে কল্পনা হচ্ছে সেই জ্ঞান বা প্রতীতি, যে প্রতীতিতে বাচকশব্দ বা নামের সংসর্গ আছে। কিন্তু ধর্মকীর্তি বলেন যে, কল্পনার লক্ষণ এইভাবে নির্দেশ করলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। কারণ, নামাদির যোজনা ব্যতিরেকেও বিকল্পত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন, সদ্যোজাত শিশু ও মূকাদির জ্ঞানে সামান্যাকার প্রতিভাস হয়, ইষ্টানিষ্ট সাধনের যোগ্যতা আছে। তাই

সদ্যোজাত শিশু তার মাতৃদুগ্ধ পান করে, যদিও সদ্যোজাত শিশু তার ইষ্টতাবোধক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করতে পারে না। মূক, বধির ব্যক্তি ও সদ্যোজাত শিশুর শব্দ ও অর্থের সংকেত সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকায়, তাদের জ্ঞান শব্দসংসর্গযুক্ত বা ভাষায় প্রকাশিত জ্ঞান নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে জ্ঞানে ইষ্টসাধনতাবোধ আছে, সেই জ্ঞানই বিচারবিশ্লষণাত্মক জ্ঞান। ঘটাদিতে ইষ্টসাধনতাবোধ আছে। সুতরাং তাদের ঐ বস্তুগুলি সম্বন্ধ বিচারবিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান আছে। সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপানাদিতে ইষ্টসাধনতাবোধ আছে বলেই স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তাদেরও বিচারবিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান আছে, এটা অবশ্যস্বীকার্য। তাই ধর্মকীর্তির মতে দিগ্‌নাগ প্রদত্ত কল্পনার লক্ষণ স্বীকার করলে সদ্যোজাত শিশুর ও মূকাদির জ্ঞানে কল্পনার লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষের উদ্ভব হবে। তাই তিনি কল্পনার লক্ষণে 'যোগ্য' পদটি অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কল্পনার লক্ষণে 'যোগ্য' পদটির গুরুত্ব প্রসঙ্গে ধর্মকীর্তি বলেছেন যে, 'যোগ্য' পদটি না দিলে ব্যুৎপন্নসংকেতব্যক্তির ও অব্যুৎপন্নসংকেতব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য হবে না। অব্যুৎপন্নসংকেতব্যক্তির বালক ও মূকাদির ব্যক্তি, যাদের শব্দ সংকেতের জ্ঞান জন্মায় নি। ব্যুৎপন্নসংকেতব্যক্তি হচ্ছে তারা, যাদের শব্দ সংকেতের জ্ঞান আছে অর্থাৎ কোন্ শব্দ কোন্ অর্থকে বোঝায়, এই জ্ঞান যাদের উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর মতে কল্পনার লক্ষণে 'যোগ্য' পদটি না দিলে যে জ্ঞানে অভিলাপ বা বাচক শব্দের নামের প্রতিভাস নেই, তা কল্পনা হবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, বালক ও মূকাদির সবিকল্পক জ্ঞান আছে (কারন, তাদের ইষ্টসাধনতাবোধ আছে)। বালক ও মূকব্যক্তির বাচকশব্দের জ্ঞান না থাকলেও তাদের সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। তবে বাচকশব্দের জ্ঞান না থাকায় এদের সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বাচকশব্দের সংসৃষ্ট নয়। কিন্তু মূকবধির, এদের অন্ততঃ অশব্দসংসর্গের যোগ্যতাবিশিষ্ট জ্ঞান আছে। কারণ এরা ক্রিয়াসম্পাদন করে, ইষ্টসাধনে সক্ষম হয়। তাই বলা হয়েছে ধর্মকীর্তি বলেছেন যে, 'অভিলাপ সংসর্গযোগ্য প্রতিভাস প্রতীতিঃ কল্পনা'।

ধর্মকীর্তির মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যে অর্থ প্রকাশ পায়, তা ঐ রূপ শব্দসংসর্গের যোগ্যও নয়। সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হলো যথার্থ প্রত্যক্ষ। ধর্মকীর্তি বলেন যে, বালমূকাদির ইষ্টসাধনতাবোধ আছে এবং সেইঅনুসারে তারা কার্য্য করে, কিন্তু তাঁর মতে এই ইষ্টসাধনতাবোধ শব্দের দ্বারা প্রকাশিত না হলেও, ঐ বোধগুলির শব্দের সঙ্গে সংসর্গের যোগ্যতা আছে। তিনি বলেছেন যে, অর্থের সামান্যকার প্রতিভাস মাত্রই বাচক সামান্যাকার প্রতীতি থাকায়, তাদের জ্ঞানে অভিলাপের সংসর্গ না থাকলেও অভিলাপের সংসর্গের যোগ্যতা আছে। অতএব অভিলাপসংসর্গ যোগ্যতা ঘটিত যে কল্পনার লক্ষণ, তার দ্বারা ঐ ইষ্টসাধনতা প্রতীতিও যথাযথভাবে কল্পনার লক্ষণে সংগৃহীত হয়েছে।

এখন দেখা যাক্ ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষের লক্ষণের 'অভ্রান্ত' পদটি কেন যোগ করেছেন। যদিও 'কল্পনাপোঢ়' পদটি প্রত্যক্ষের লক্ষণে দিলে বিকল্পজ ভ্রম থাকে প্রত্যক্ষের ভেদ সাধিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়জভ্রমের ক্ষেত্রে বিকল্প থাকে না। সুতরাং শুধু 'কল্পনাপোঢ়' দিয়ে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করলে ইন্দ্রিয়জভ্রান্তিএ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণের অব্যাপ্তি হবে। তাই তিনি প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অভ্রান্ত' পদটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন, দ্রুতগামী যানে অবস্থিত পুরুষ স্বস্থানে অবস্থিত বৃক্ষ সকলকে দ্রুত গমনশীল বলে দেখে, যা চলৎবৃক্ষদর্শন নামে অভিহিত। ফলে বৃক্ষের যথার্থ প্রত্যক্ষ হয় না। তাই এই জ্ঞানটি ভ্রান্ত এবং ধর্মকীর্তির মতে এটি ইন্দ্রিয়জভ্রান্তি। সুতরাং 'ভ্রমভিন্নত্ব' বিশেষণটি না দিলে চলৎবৃক্ষদর্শনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণটির অতিব্যপ্তি হবে। কারণ চলৎবৃক্ষদর্শন সংবাদকজ্ঞান নয়। সংবাদকজ্ঞান বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝায়, যে জ্ঞান যথোপ্রদর্শিত অর্থের প্রাপ্তি হয়। চলৎবৃক্ষদর্শনের ক্ষেত্রে যে কথা বলা হয়েছে, অনুরূপকথা তৈমিরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বিচন্দ্রদর্শনের ক্ষেত্রে, কামলাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পীতশঙ্খ দর্শনের ক্ষেত্রে এবং অলাতচক্র দর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই গুলি সবই ইন্দ্রয়জভ্রান্তি। একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ডকে খুব দ্রুত বেগে ঘোরালে দ্রষ্টার মনে হয় যে, সে একটি আলোকচক্রকে দেখেছে। এই জ্ঞানটি কিন্তু ভ্রান্তজ্ঞান।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইন্দ্রিয়জভ্রান্তি ও বিকল্পজভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, দ্রষ্টা বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়জাভ্রান্তি দূরীভূত হয় না। অর্থাৎ তৈমিরিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, চন্দ্র দুটি নয়, চন্দ্র একটি, তাসত্ত্বেও সে দ্বিচন্দ্রই দর্শন করে। অনুরূপভাবে দ্রষ্টাকে বিচারবিশ্লেষণ দিয়ে যত স্পষ্ট করেই বোঝানো হোক না কেন যে, বৃক্ষসকল গতিশীল নয়, বৃক্ষসকল অচল, তাহলেও সে বৃক্ষসকলকে চলন্ত হিসাবেই প্রত্যক্ষ করে। আবার একটি জ্বলন্ত

কাষ্ঠখন্ডকে ভুল করে চক্রের মতো দেখাচ্ছে, এটা বুঝিয়ে বলা সত্ত্বে, দ্রষ্টা একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ খণ্ড কিন্তু প্রত্যক্ষ করে না বরং জ্বলন্ত চক্রই প্রত্যক্ষ করে। বিকল্পজভ্রান্তির ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। কারণ, বিচারবিশ্লেষণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে জ্ঞাতার ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। উদাহরণ স্বরূপঃ কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়ার পর তাকে যদি স্পষ্ট আলোকে বিচারবিশ্লেষণ দিয়ে বুঝিয়ে বলা হয় যে, এটা সর্প নয়, এটা রজ্জু। তার পর কিন্তু জ্ঞাতার ভ্রান্তি দূরীভূত হয় এবং তার এইরূপ জ্ঞান হয় যে, এটা আসলে রজ্জু, এটা সর্প নয়।

শান্তরক্ষিত ধর্মকীর্তি প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণকে মেনে নিয়ে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এভাবে, "প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্".[৫] প্রত্যক্ষ হলো তাঁর মতে বিকল্পবিরহিত ও অভ্রান্তজ্ঞান। তিনি ধর্মকীর্তির মতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলেছেন যে, 'কল্পনাপোঢ়' পদটি প্রত্যক্ষের লক্ষণের দিলে বিকল্পজভ্রান্তি (মানসভ্রান্তি), অনুমান ইত্যাদির থাকে প্রত্যক্ষের পার্থক্য নির্দেশ করা যায় ঠিকই, কিন্তু ইন্দ্রিয়জভ্রান্তি থাকে প্রত্যক্ষের পার্থক্য সূচনা 'কল্পনাপোঢ়' পদ দিয়ে সম্ভব নয়। চলৎবৃক্ষদর্শন, অলাতচক্রদর্শন, দ্বিচন্দ্রদর্শন, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়জভ্রান্তি থেকে প্রত্যক্ষের পার্থক্য সূচনা করার জন্য 'অভ্রান্ত' পদটির প্রয়োজন। তাঁর যুক্তি হলো এইরকম যে, বিকল্পজ তথা মানসীভ্রান্তি বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে অপসারিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়জভ্রান্তি বিচারবিশ্লেষণের দ্বারা অপসারিত হয় না। যদি সমস্ত ভ্রান্তি মানসীভ্রান্তি হতো, তাহলে সমস্ত ভ্রান্তিই উৎপন্ন হতো অনাদি বিকল্প বাসনা থেকে এবং ভ্রান্তিগুলি দূর হোত বেগবতী ইচ্ছা ও বিচারবিশ্লেষণ দ্বারা.[৬]

নৈয়ায়িকেরা এখানে আপত্তি তুলেছেন যে, ইন্দ্রিয়জভ্রান্তি বিচার বিশ্লেষণ ও বেগবতী ইচ্ছার দ্বারা দূরীভূত হয় না কিন্তু বিকল্পজ মানসীভ্রান্তি বিচারবিশ্লেষণ দ্বারা দূর হয়, একথা ঠিক নয়। কারণ, বৌদ্ধমতে স্থায়ী বস্তুর অস্তিত্ব নেই, একথা বিচারবিশ্লেষণ দ্বারা জানার পরেও কোন বস্তুকে জাতিবিশিষ্ট বলে মনে হয়। এই আপত্তির উত্তরে শান্তরক্ষিত বলেছেন যে, বেগবতীইচ্ছা এবং ধ্যান ও ধারণার প্রকর্ষ দ্বারা মানসীভ্রান্তি দূর হওয়া সম্ভব একমাত্র তখনই ইন্দ্রিয়ের দোষ যখন চলে যায় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যখন রোগমুক্ত হয়) এবং যদি প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর উপস্থিত থাকে।[৭]

নৈয়ায়িকেরা দিগ্‌নাগের নির্দেশিত কল্পনার লক্ষণে 'নামযোজনা' ও 'জাতিযোজনা' পদের ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন আপত্তি তুলেছেন। শান্তরক্ষিত দিগ্‌নাগের প্রদত্ত কল্পনার লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সেইসব আপত্তি তুলে ধরেছেন এবং তার উত্তরে দিয়েছেন। নৈয়ায়িকেরা প্রশ্ন তুলেছেন যে বৌদ্ধমতে জাতি স্বীকৃত হয় নি, অথচ দিগ্‌নাগ কল্পনার লক্ষণে 'নামযোজনা' ও 'জাতিযোজনা' পদের ব্যবহার কিভাবে করাচ্ছেন? এই আপত্তির উত্তর প্রসঙ্গে শান্তরক্ষিত বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে শুধু 'নামযোজনা' পদ দিয়েই কল্পনার লক্ষণ করা যায়, 'জাতিযোজনা' পদের দরকার হয় না। তিনি দিগ্‌নাগের মতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য বলেছেন যে, 'নামযোজনা' (বা যদৃচ্ছা শব্দযোজনা) জাতিযোজনার (অর্থাৎ সমানাকারপ্রতীতি) সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। যেমন, ডিথ একজন ব্যক্তি বিশেষের নাম, যা জাতিকেও নির্দেশ করে। তাঁর মতে নাম সর্বদা জাতিকে নির্দেশ করে। নামযোজনা তাই এক অর্থে জাতিযোজনাকেই নির্দেশ করে। তবে জাতি বলতে এখানে কিন্তু নৈয়য়িক স্বীকৃত জাতিকে বোঝান হয়নি, জাতি বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সামান্যলক্ষণকে যা নাকি সমানাকারপ্রতীতির জনক। তিনি বলেছেন যে, যদি একটা নাম জাতিকে নির্দেশ না করতো, তাহলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজনকে একই নামে ডাকা সম্ভব হতো না। বৌদ্ধমতে প্রত্যেক বস্তু ক্ষণিক। কিন্তু দিনের পর দিন একজন ব্যক্তির জন্য বা একটি বস্তুর জন্য একটি নাম ব্যবহার করা সম্ভব হয়, কারণ বৌদ্ধমতে একই সন্তানের অর্ন্তগত বিভিন্ন ক্ষণের মধ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে থাকায় তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এক ধরণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাদৃশ্য থাকার জন্য জ্ঞাতার মনে সামান্যলক্ষণের (যা নাকি সমানাকারপ্রতীতির জনক) জ্ঞান উপস্থিত হয়। এইভাবে দেখলে যখনই অর্থের সঙ্গে কোনও নামের যোজনা হয়, তখনই ঐ অর্থের সঙ্গে সামান্যলক্ষণের (যাকে ন্যায়মতে জাতি বলা হয়) যোজনা হয়ে থাকে, একথা ধরে নিতে হবে। দিগ্‌নাগকে সমর্থন করে শান্তরক্ষিত বলেছেন যে, কল্পনা হলো এমন একটি জ্ঞান, যার বিষয়টি নামের (অর্থাৎ অভিলাপের) সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।[৮]

উদ্দ্যোতকর বলেছেন যে প্রত্যক্ষ বলতে যদি এরকম জ্ঞানকে বোঝানো হয়, যেখানে বাচকশব্দ থাকবে না, তাহলে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ হবে অনভিলাপ্য। 'কল্পনাপোঢ়' ও 'অনভিলাপ্য' যদি সমার্থক হয়, তাহলে বৌদ্ধরা প্রত্যক্ষকে সংজ্ঞায়িত করতে প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'প্রত্যক্ষ' পদটি কিভাবে ব্যবহার করেছেন? 'প্রত্যক্ষ'

পদটি তো একটি শব্দ বা অভিলাপ। যদি প্রত্যক্ষ বলতে অনভিলাপ্য বোঝায় এবং প্রত্যক্ষের লক্ষণে যদি 'প্রত্যক্ষ' পদ ব্যবহৃত হয়, তাহলে তো স্ববিরোধ দোষ উৎপন্ন হবে। এই আপত্তির উত্তরে শান্তরক্ষিত বলেছেন যে, 'কল্পনাপোঢ়' বলতে বৌদ্ধরা প্রত্যক্ষের অনভিলাপ্যত্বকে বোঝান নি। 'প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়', এই উক্তির দ্বারা তাঁরা এইকথা বোঝাতে চেয়েছেন যে যখন জ্ঞানের বিষয়টি বিকল্পজ হবে না। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়টি হবে স্বলক্ষণ (যা শব্দের দ্বারা ব্যক্ত নয়) এবং বিষয়টিকে বিকল্প দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় না, তখনই জ্ঞানটিকে বলা হবে কল্পনাপোঢ়জ্ঞান। সুতরাং প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'প্রত্যক্ষ' পদটি স্ববিরোধ দোষ সৃষ্টি করে না।

উদ্দ্যোতকর আরও বলেছেন যে, বৌদ্ধমতে কল্পনা হচ্ছে একধরনের জ্ঞান। এই জ্ঞানটি বাচকশব্দ বা অভিধেয়পদের আধার হয়। 'কল্পনাপোঢ়' বলতে বৌদ্ধরা সেই জ্ঞানকে নির্দেশ করেছেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানরূপ আধার এবং শব্দরূপ আধেয় এদের মধ্যে সম্বন্ধ অস্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু উদ্দ্যোতকর বলেন যে, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধরা আধার আধেয় সম্পর্কটিকে যথার্থ সম্পর্ক বলেন নি, সেক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যক্ষকে কল্পনাপোঢ় বলতে কি বুঝিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শান্তরক্ষিত বলেছেন যে, প্রত্যক্ষ কল্পনাপোঢ়, এই মন্তব্যের দ্বারা দিগ্‌নাগ আধারআধেয়ভাবের অস্বীকৃত বোঝান নি, প্রত্যক্ষের কল্পনাপোঢ়ত্ব বা অবিকল্পকত্ব বলতে তাঁরা সবিকল্পক জ্ঞান ও নির্বিকল্পক জ্ঞানের তাদাত্ম্য সম্পর্কের নিষেধের কথা বলেছেন। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ কখনই সবিকল্পক জ্ঞান হয় না। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হলো কল্পনাপোঢ়ত্ব, অর্থাৎ যার বিষয়টি অর্থসামান্যাকারপ্রতীতি নয়।

নির্দেশপঞ্জী:

১। দিগ্‌নাগ, *প্রমাণ সমুচ্চয়,* অনন্ত কুমার তর্কতীর্থ রচিত বৈভাষিক দর্শন গ্রন্থে সংকলিত, পৃষ্ঠা - ৩৪৯
২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৪৯-৩৫০
৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৫২
৪। *ন্যায়বিন্দু,* সুত্র - ৪
৫। *তত্ত্ব সংগ্রহ,* শান্তরক্ষিত, সম্পাদনা দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী, বৌদ্ধ ভারতী, বারাবসী, ১৯৮২, সুত্র - ১২১৩
৬। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, সুত্র - ১৩১৬
৭। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, সুত্র - ১৩২২
৮। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, সুত্র - ১৩৩২

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বালুরঘাট কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।